নিসর্গের জাপান

শেগুফতা শারমিন

যন্ত্র এবং জাপান, দুটো যেন একই শব্দ। এমন ধারণা পোষণ করছি সেই ছোটবেলা থেকেই। যখন নারিতা এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম, তখনও আমি আমার বিশ্বাসেই অটল। কারণ এতো বড় এয়ারপোর্টের প্রতিটি মানুষ যেন রোবট। অকারণে কেউ ডানে ঘোরে না, বামে তাকায় না। দম দেয়া পুতুলের মতো যার যার কাজ করছে- অত্যন্ত দ্রুত, কিন্তু নিপুণতার সঙ্গে। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমরা যখন লম্বা কিউ করে লাগেজ নেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছি, তার আগেই দেখি লাগেজরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। যস্মিন দেশে যদাচর প্রবাদটি মেনে নিয়ে আমরাও ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে গেলাম। যেতেই দেখি কাজী ইনসান দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। কাজী ইনসান জাপান থেকে প্রকাশিত 'পরবাস' পত্রিকার সম্পাদক। 'পরবাস' পত্রিকার আমন্ত্রণেই জাপানে আসা। ১৮ ঘন্টা (ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর সাড়ে তিন ঘণ্টা, এয়ারপোর্টে সাত ঘণ্টা অপেক্ষা, কুয়ালালামপুর থেকে নারিতা সাত ঘণ্টা) পর দু'জন বাঙালি এতো কাছের একজনের দেখা পেয়ে একেবারেই বাঙালি হয়ে উঠলাম।

জাপানি ট্রেনে প্রথম যাত্রা

বাইশ দিনের জাপান ভ্রমণে ট্রেনই ছিল আমাদের সবচেয়ে পছন্দের বাহন। জাপানের যন্ত্রজীবনের এই প্রধান অনুষঙ্গটির পরিচয় পেলাম টোকিওতে পা দেয়ার প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই। একদম এয়ারপোর্টের পেটের ভেতর থেকেই শুরু হলো আমাদের ট্রেন যাত্রা। জাপানি ট্রেনের বর্ণনা দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য আর শোকগাথা তৈরি করতে চাই না। যা হোক, প্রায় দেড় ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণ শেষে আমরা ট্যাক্সি ধরতে যে স্টেশনে নামলাম, তৃতীয় বিশ্বে বড় হওয়া চোখে তাকেই মনে হলো কোনো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট!

স্টেশন থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হবে কিতা-কু, রাহমান মনির বাসায়। রাহমান মনি 'পরবাস'-এর টোকিও সম্পাদক। যান্ত্রিক টোকিও নগরের ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা।

মনি ভাইয়ের বাসার সামনে পৌঁছতেই যখন ছোটবেলার পাঠ্যবইয়ে পড়া 'চীন-জাপানের শিশু', গল্পের কল্পিত চরিত্রের মতো ইফা আর আশিক তাদের শিশুসুলভ চপলতা ও ভালোবাসায় আমাদের জাপানে বরণ করে নিলো, তখন মুহূর্তেই মুছে গেল পথের ক্লান্তি, দেশ থেকে দূরে যাওয়ার কষ্ট।

বৃষ্টি দিয়ে স্বাগতম

যে রাতে আমরা টোকিও পৌঁছলাম, কোথা থেকে যেন জাপানি মেঘ খবর পেয়ে গেলো অতিথিরা বৃষ্টি ভালোবাসে। সারা রাত অঝোর ধারায় ঝরলো জাপানি বৃষ্টি। যেন অতিথিদের ঘুম ভাঙার আগেই আরেকবার সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সাজিয়ে তুলবে। সারা রাত ধরে দায়িত্ব পালন করে ভোরের আগেই বৃষ্টি বিদায় নিলো। আর আলো ফোটার পরে যখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন তো বিস্ময়ে হতবাক। একটা শহরের আবাসিক এলাকা এতো সুন্দর হতে পারে! বিশতলা ভবনের চারদিকে অজস্র সবুজ গাছ, খোলা মাঠ, পার্ক সবাই সদ্য স্নানের পবিত্রতা থেকে যেন বলছে স্বাগতম। চোখের সামনে যতটুকু টোকিও দেখা গেল, মনে হলো পুরোটাই একটা সবুজ কবিতা।

হেরে গেলাম নিক্কোতে

আমার সেই বয়ে বেড়ানো যন্ত্র জাপানের পুরনো ধারণা প্রথম থেকেই ভুল প্রমাণিত হতে থাকলেও

†Ub †_‡K Z‡j wQ ckvš gnvmvM‡i i Qwe

পুরোপুরি হেরে গেলাম নিক্কোতে গিয়ে। জাপান পৌঁছানোর একদিন পরেই প্রকৃতিপ্রেমিক কবি মোতালেব শাহ আইয়ুব, প্রিন্স ভাই নামে যিনি পরিচিত, আমাদের নিয়ে গেলেন প্রকৃতি দেখাতে। ২০০৪ সালের নবেম্বরের তিন তারিখ ভোর সাতটায় প্রিন্স ভাই আর তার জাপানি বন্ধু (যার নামটা কোনোক্রমেই বুঝতে না পেরে সারা দিন কোনো না কোনো বাংলা নাম ধরে ডেকেছি) ইফা, আশিক, মনি ভাইসহ আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে গেলেন। মোট সাতজনের দলে আমিই জাপানে প্রথম। তাই সবার চোখে যেটাই পড়ে সেটাই আমাকে দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাস্তা, ফ্লাইওভার, নদী, বিল্ডিং, সবজি ক্ষেত সবকিছুই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছি। ডানে-বামে এসব একঝলকে দেখেই গভীর মনোযোগে সারা পথ আমি যা দেখেছি তা হলো গাড়ি। কোনটা টয়োটা, কোনটা নিশান, হোন্ডাটা বেশি সুন্দর, কতোগুলো মার্সিডিস বেঞ্চ একসঙ্গে দেখলাম, সেটাই আমার বড় বিনোদন হয়ে উঠলো। এরই মাঝে শহর পেরিয়ে গেছি। দু'দিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত', দূরে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ শুনি গাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। একটু খেয়াল করতেই দেখি, না কোনো রেকর্ডার বাজছে না, প্রিন্স ভাই খালি গলায় গাইছেন 'আলো আমার আলো ওগো আলোর ভুবন ভরা।' যেন ভুবন ভরা এতো আলোর মাঝেও ফেলে আসা দেশ ভুলতে দেয় না কোনো কিছুই।

নিক্কোর পথে পথ ফুরানোর আগেই দেখি দূরের পাহাড়গুলো ক্রমেই কাছে চলে আসছে। কোথাও যেন পথ আগলে ধরছে পাহাড়। এগুলো আগে দেখা কোনো পাহাড়ের মতো নয়। এর সমস্ত গা জুড়ে যেন কোনো শিল্পী অনেক রকম রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা ... কত রকম রঙ! এই প্রথম অনুভব করলাম প্রকৃতি এখানে কোনো কার্পণ্য করেনি। বরং আরো বেশি উদার হাতে দান করে গিয়েছে। আর নিয়মতান্ত্রিকভাবে জাপানিরাও অত্যন্ত ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় এই উপহার সাজিয়ে রেখেছে, কোনো রকম ত্রুটি ছাড়াই।

আরিগাতো থেকে ওয়ানতানামো

নিক্কো আসলে টোকিওর পাশে খুব জনপ্রিয় একটি পর্যটন এলাকা। রঙ-বেরঙের ম্যাপল গাছে ছাওয়া অসংখ্য পাহাড় আর টিলার মাঝে কয়েকশ' বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্দির।

এখানে রয়েছে তিনটি বানরের ছবি। যাদের একজনের চোখ বন্ধ, একজনের মুখ বন্ধ, একজনের কান বন্ধ অর্থাৎ 'মন্দ কিছু দেখবো না, মন্দ কিছু বলবো না, মন্দ কিছু শুনবো না'। এই থিমটার প্রচার হয়েছে এই মন্দির থেকেই।

নিয়মিত প্রার্থনা ছাড়াও সাধারণত বিয়ে বা নাম রাখার মতো বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাপানিরা এ মন্দিরে আসে।

আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা সেদিন এ রকম দু'টি অনুষ্ঠানই দেখেছি। প্রথমে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান দেখলাম। সেখানে কিমোনো পরা বর-কনেকে দেখলে পুতুল বলে ভুল হয়। এতো সুন্দরও মানুষ হয়, আর এতো সুন্দর করে তারা সাজতে পারে! সেদিন সকাল থেকেই জাপানিদের ব্যবহার দেখে বারবার মুগ্ধ হচ্ছিলাম। প্রিন্স ভাইয়ের সেই বন্ধুটি ততক্ষণে যে কিনা আমাদেরও বন্ধু হয়ে গেছেন। বিনি কথার বন্ধু। কারণ সে নিহঙ্গ (জাপানি ভাষা) ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। তবুও আমরা তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ। একটা তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে জন্মদিনে কিমোনো পরে মায়ের সঙ্গে মন্দিরে এসেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। মেয়েটার ছবি তুলতে চাইলে সঙ্গের আত্মীয়রা খুবই খুশি হয়ে অনুমতি দিল। ছবি তোলার পর আমি খুব দ্রুত তাদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য বললাম 'ওয়ানতানামো'। বলতেই দেখি মনি ভাই আর ইফা খুব জোরে হাসছে। কারণ গত দু'দিন ধরে আমাকে শিখিয়েছে 'আরিগাতো' মানে ধন্যবাদ। আর আমি সময়মতো এমন একটা শব্দ বললাম জাপানি ভাষার বিশাল ভান্ডারে যার কোনোই অর্থ নেই। তবে পরের বিশ দিন বাবা-মেয়ে 'ওয়ানতানামো' বলে আমাকে ক্ষেপিয়ে যে মজা পেত, তার মূল্যও কোনো ধনভান্ডারে নেই।

কাঁচা মাছের অমৃত ভক্ষণ

মন্দির থেকে নেমে আসার পথেই সারি সারি খাবারের দোকান। তবে সবই জাপানি খাবার। কাঁচা মাছ বা মাংস আগুনে পোড়ানো বা অল্প সেদ্ধ করে খাওয়া হচ্ছে। শুনতে যতই খারাপ লাগুক খেতে তা মন্দ নয় মোটেই। টোকিও পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর জানা ছিল আগে থেকেই। কিন্তু তাই বলে এতোটা?

তিন ইঞ্চি সাইজের একটা মাছ কাঠির মধ্যে গেঁথে ঝলসিয়ে দিল। দাম পড়লো প্রতি ইঞ্চি একশ' টাকা। অর্থাৎ একটি মাছ পাঁচশ' ইয়েন যা কি না বাংলাদেশী টাকায় প্রায় তিনশ' টাকার সমান। তবে প্রথম জাপানি খাবার খেতে মোটেও খারাপ লাগেনি। বরং মাছের এ রকম মজাদার আইটেম খুব কম খেয়েছি বলেই মনে হলো।

কান পাতলেই ঝরনার গান

নিক্কোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হলো এখানকার ঝরনা। একটা বা দুটো নয় একটু পরপরই ঝর ঝর শব্দ কানে আসবে। একটু খুঁজতেই চোখে পড়বে ডানে-বাঁয়ে বয়ে চলা বিভিন্ন চিকন-চিকন ঝরনার কার্পেট। তবে একটু কষ্ট করলেই মানে কয়েকশ' ফুট পাহাড়ি বনের রাস্তা পেরিয়ে উপরে উঠলেই যে ঝরনাটি চোখে পড়বে, তার বর্ণনা দেয়া অসম্ভব।

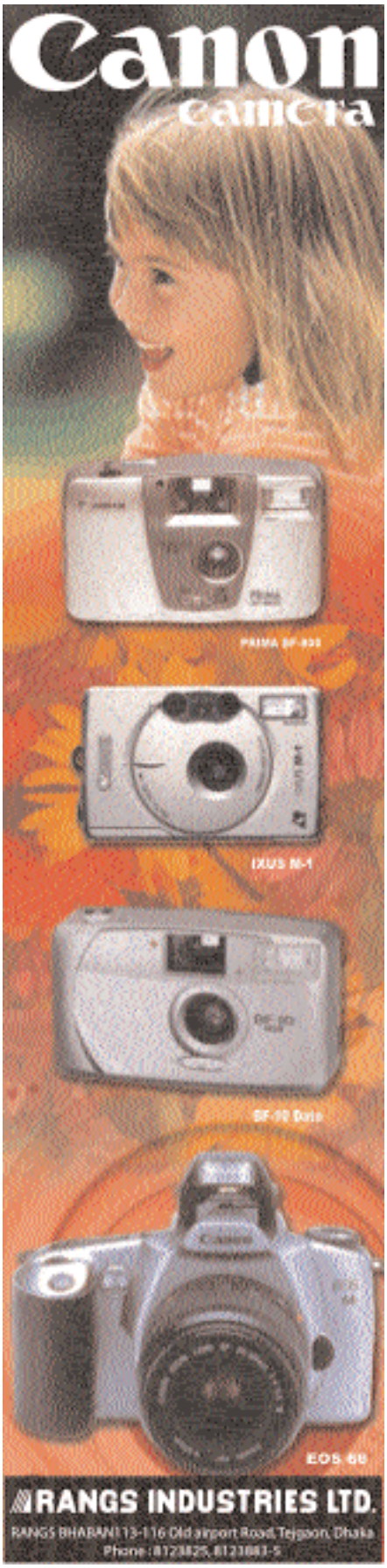

wb‡°v : †gvZv‡je kvn AvBqe, Bdv, AwkK, ivngvb gwb (evg t_‡K)

লাল, হলুদ, কমলা জমিনে আঁকা বিপুল বেগে শুভ্র জলরাশি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া এই পাহাড়ের সবচেয়ে বড় ঝরনা কন্যাটিকে দেখলে মনে হবে যেন মর্ত্য থেকে স্বর্গের জানালায় চোখ রেখেছি। এক পাহাড়ের চূড়ায় চারদিকে লোহার গ্রিল দেয়া ভিউ পয়েন্ট থেকে আরেক পাহাড়ের এই সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানো কঠিন। তবে এই কঠিন কাজটিই করে ফেলার পরে যখন চোখে পড়লো রাস্তা থেকে একটু নিচেই ঝরনার আরেকটি নদী বয়ে যাচ্ছে। তখন আমাদের চিৎকারে জাপানি বন্ধু কি বুঝলো জানি না- পাশের মাঠেই গাড়ি পার্ক করে ফেললো। আর আমাদের তখন পায় কে। কার আগে কে ঝরনার জলে নামবো, শুরু হলো তার অলিখিত প্রতিযোগিতা। তবে দলের শিশু এবং নারী তিন জনের দলটিই কেবল ইচ্ছেমতো দাপিয়ে বেড়ালাম ঝরনার পানি আর বড় বড় পাথরের সমারোহে। বাকি চার জন ডাঙায় থেকে ছবি তুলতেই আনন্দ পেল বেশি।

ঝরনার ঠান্ডা হিমশীতল স্বচ্ছ জলে পা ডুবিয়ে কেবলই মনে হলো কে বলে জাপান শুধু টেকনোলজির দেশ, শুধু যন্ত্রের দেশ? যন্ত্রের পাশাপাশি এ রকম ভার্জিন বিউটির সহাবস্থান আর কোথায় আছে?

জাপানের আরেক রূপসী ললনা 'ইজু'

শুধু নিক্কোতেই নয়, ততদিনে টোকিওর কাছে-দূরে প্রায় সব জায়গাতেই প্রযুক্তি আর প্রকৃতির সহাবস্থান দেখতে দেখতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু জাপানের প্রকৃতি যে আরো কত সুন্দর হতে পারে ইজুতে না গেলে হয়তো তা কল্পনাতীতই থাকতো। টোকিও থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে ইজু একটি বেশ বড় উপদ্বীপ। অসম্ভব সুন্দর ওই উপদ্বীপে জাপানিদের প্রধান আকর্ষণ হট স্প্রিং স্পট আর ওনসেন। ১৩ নবেম্বর ভোর ৬টায় ট্রেনে ইনসান ভাই আর আমাদের সে দিনের গাইড ইফার সঙ্গে যখন রওনা হলাম, তখনো আমরা দু'জনের কেউ জানি না কত সুন্দর একটি জায়গায় যাচ্ছি। অকাবানে স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেনে উঠে গেলাম টোকিও স্টেশনে। এ যাত্রায় প্রথম স্টেশনের বর্ণনা না দিলে খুবই অন্যায় হয়ে যায়। এই স্টেশনটি দু'টি ভাগ। প্রথম সাততলা মাটির ওপরে আর বাকি সাততলা মাটির নিচে। সবচেয়ে সত্যি যেটা, সেটা হলো সিঙ্গাপুর চাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকেও বড় টোকিও রেলস্টেশন। অথচ ছোটবেলার ভূগোল বইয়ে পড়েছি এশিয়ার সবচেয়ে বড় স্টেশন কমলাপুর!

wewb K_vi
Rvcwb eÜ

টোকিও স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার মাত্র আধাঘন্টা পর থেকেই বুঝতে পারলাম শহর ছেড়ে আমরা শহরতলীর দিকে যাচ্ছি। একটু পর শহরতলীও নেই। প্রায় গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলতে লাগলো। রেলগাড়ির চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী নদী, শস্যক্ষেত পেরিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। এবারে আমাদের গন্তব্য আতামি। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম পুরো ট্রেনে আমাদের সহযাত্রীদের কারো বয়সই ৫০-এর কম নয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষেরা যাদের বেশির ভাগই মহিলা। তারা চলছে উইকএন্ডে সময় কাটাতে। যে বয়সে আমাদের দেশের মহিলাদের দেখি শত চিন্তায় ক্লিষ্ট একজন পরাজিত নতজানু মানুষ, সেই বয়সের জাপানি মহিলারা দলবেঁধে সমবয়সী বান্ধবীদের নিয়ে চলেছে অবকাশ যাপনে। পুরো চেহারায় তাদের সুখী মানুষের প্রতিচ্ছবি।

আতামী পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই পাহাড়ের দেখা মিলছিল। এ পাহাড়গুলোও যেন সুখী পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটি বা দুটি জাপানি স্টাইলের ছোট ছোট দোতলা বাড়ি। আর পুরো পাহাড় জুড়ে কমলা বাগান। গাঢ় রঙের কমলালেবু আর হলুদাভ গ্রেপ ফ্রুট যেন অলঙ্কার হয়ে শোভা পাচ্ছে পাহাড়ের গায়। পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য মাঝে মাঝেই ঢেকে যাচ্ছিল নিকষ-কালো অন্ধকারে। পাহাড় কেটে রেললাইন বসানোর জন্য অনেক সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হয়েছে। একটি বা দুটি নয়, প্রায় প্রতি মিনিটেই আমরা একেকটি সুড়ঙ্গ পার হচ্ছিলাম- এভাবে আলো-অন্ধকারের খেলার ফাঁকে হঠাৎই বামদিকে তাকিয়ে দেখি বিশাল জলরাশি। উহু সমুদ্র নয়, একেবারে মহাসমুদ্র। সত্যি সত্যি প্রশান্ত মহাসাগর দেখছি একেবারে রেললাইনের পাশ দিয়ে। রেললাইন আর সমুদ্রের মাঝে শুধু মেরিন ড্রাইভ। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে পাহাড়, কখনো তা মাথা বাড়িয়ে এগিয়ে গেছে সমুদ্রের ভেতর দিকে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট রিসোর্ট। স্বর্গের প্রবেশদ্বার হয়তো এ রকম সুন্দর হলেও হতে পারে। তবে স্বর্গে না গেলেও ততক্ষণে আমরা আতামী স্টেশন পৌঁছে গিয়েছি। এবার চললাম ট্রয় ট্রেনে। একই রকম পথে রূপকথার মতো সুন্দর ট্রয় ট্রেনে চড়ে চলেছি জোগাসাকি কাইগেনের দিকে। মিনিট বিশেক পরে নেমে তো অবাক! পুরো স্টেশনটি কাঠের তৈরি। বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি স্টেশন, ওয়েটিং রুম, বসার বেঞ্চ... টয়লেট। জাপানের যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই গাছের প্রতি তাদের অতিমাত্রার যত্ন চোখে

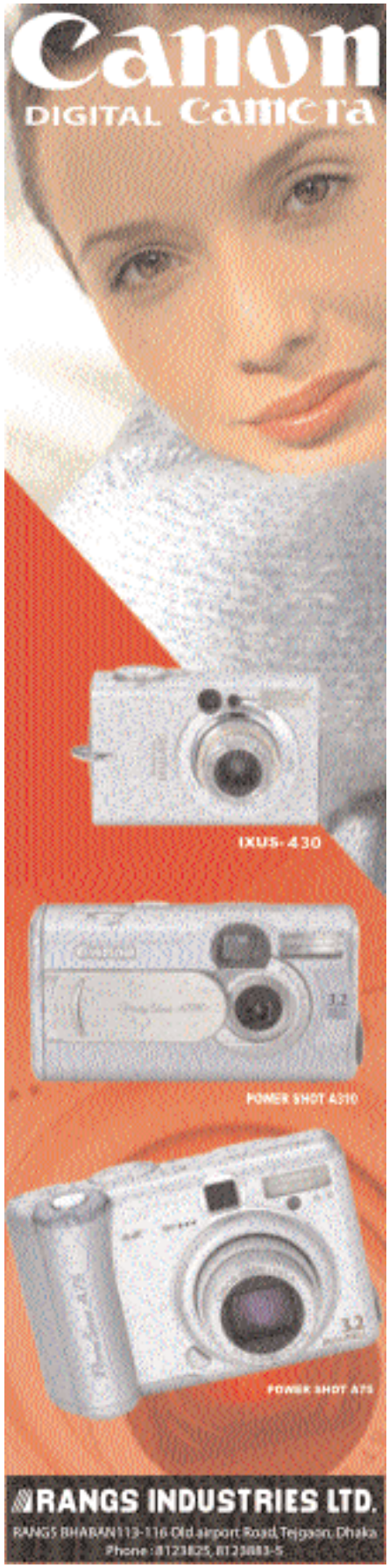

wb‡°v‡Z Rvcwb wkï

পড়েছে। নিক্কোতে দেখেছি আটশ' বছরের গাছগুলোকে কিভাবে তার দিয়ে বেঁধে রক্ষা করা হয়েছে। আর এখানে আস্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে গোটা একটি স্টেশন তৈরি করেছে। মন দিয়ে পরখ করতেই- ভুল ভাঙলো। এগুলো তো সত্যিকার কাঠ নয়। কৃত্রিমভাবে বানানো কাঠের মতো কিছু একটা। এখানে যেন আবারো প্রযুক্তি দিয়ে প্রকৃতি রক্ষার প্রচেষ্টা টের পেলাম।

এই তো আর দশ মিনিট

স্টেশন থেকে বের হয়ে ম্যাপ দেখে ইফা বেশ কয়েকটি পথের সন্ধান বের করলো। আমরা চললাম কাদোয়াকি লাইট হাউজের দিকে। ইনসান ভাই আশ্বাস দিলেন হাঁটা পথে ১০ মিনিট লাগবে। হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটাপথের দু'ধারে যা দেখছি, তাকে শহর বলব না গ্রাম বলবো বুঝতে পারছি না। নিরিবিলি শান্ত ছোট্ট এ পাহাড়ি পথের দু'ধারে যে বাড়িগুলো তা জাপানী ধনীদের অবকাশ কেন্দ্র। বছরে একবার-দু'বার এসে বেড়িয়ে যায় এই বাংলো টাইপ সুন্দর বাড়িগুলোতে। কোন বাড়িটা বেশি সুন্দর, কাদের বাগানটা ব্যতিক্রম এগুলো যাচাই করতে করতে পৌঁছে গেলাম লাইট হাউজের পায়ের কাছে।

আমরা লাইট হাউজের পায়ের কাছে আর আমাদের পায়ের কাছে তখন প্রশান্ত মহাসাগর। ১৭ মিটার উঁচু লাইট হাউজে উঠে দেখতে পেলাম দূর সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট পাঁচটি জনবসতিহীন দ্বীপ।

লাইট হাউজ ছেড়ে আমরা চললাম ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইকিংয়ে। নিকষ-কালো পাথুরে পাহাড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ এসে ধাক্কা খেয়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা চলছি একটি দড়ির ব্রিজ দিয়ে। মহাসাগরের ওপর ব্রিজ, বেশ আজব দেখাচ্ছে হয়তো। আসলে সমুদ্র একজায়গায় গুটি-সুটি মেরে পাহাড়ের কোলে ঢুকে পড়েছে। সে কোনাটা পার হতেই তৈরি হয়েছে এই ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে বনের পথ। সবশেষে পৌঁছে গেলাম ছোট্ট একটি সী ফুড রেস্তোরাঁয়। ছনে ছাওয়া কুঁড়েঘর স্টাইলের রেস্তোরাঁয় টাটকা মাছ দিয়ে লাঞ্চ সেরে আবার ফিরে চললাম পুরনো পথে।

পথ হারালো পাহাড়ি পথে

আমাদের আসল গন্তব্যে কিন্তু আমরা এখনও পৌঁছাইনি। আমরা যাচ্ছি ইজু কোগেন। যাওয়ার পথে তার আগের স্টেশনে নেমে দেখে নিলাম সেখানকার রূপ। এরপর আবার হাঁটা শুরু হলো ইজু কোগেন স্টেশনের দিকে। আমরা যেই রিসোর্টে থাকবো সেখান থেকে বাস এসে আমাদের তুলে নেবে স্টেশন থেকে। পিচ ঢালা পাহাড়ি পথে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। কোনো বাড়ি ঘর নেই, জনমানব নেই। আমরা ৪ জনই পথচারী। ইনসান ভাই এবার প্রথমেই দশ মিনিট না বলে বললেন আধাঘন্টার পথ। একবার আধাঘন্টা পার হওয়ার পর বললেন এইতো আর দশ মিনিট। তো আমরাও দশ মিনিটের পথ চলছি প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ। কিন্তু স্টেশনের দেখা নেই। ততক্ষণে বুঝে ফেলেছি আমরা পথ হারাইনি বটে, পথ আমাদের হারিয়ে ফেলেছে। পুরো রাস্তায় কোন জনমানব নেই। হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধা তার পোষা কুকুর নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়েছেন। কিন্তু তার হাঁটার গতি আমাদের চেয়ে বেশি। এবার আমরা তাকেও হারালাম। অনেকক্ষণ পর দেখি সে ফিরে যাচ্ছে, অথচ আমরা ততক্ষণে খুব বেশিদূর আগাইনি। এবার বুঝলাম আমরা যে রাস্তার চলেছি এটা ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে। আর আমরাও তাতে ঘুরপাক খাচ্ছি। অথচ সেই বুড়ি শর্টকাটে ঘুরে আবার একই জায়গায় এসেছে।

পথ হারানোর ক্লান্তিতে আমরা সব দিশেহারা। হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে আবিষ্কৃত হলো একটা খালি ট্যাক্সি। আমাদের দেখে হয়তো মহিলা ড্রাইভারের মায়া হয়েছে, একেবারে আমাদের পাশ ঘেঁষে ব্রেক করলো। আমরা যেন জীবনে প্রথম ট্যাক্সিতে উঠলাম, এমন আনন্দ নিয়ে উঠে পড়লাম। মাত্র পাঁচ মিনিটেই দেখি স্টেশন চোখের সামনে হাজির। যথারীতি বাস ড্রাইভার ছিল আমাদের অপেক্ষায়। বড় একটা বাসে আমরা চারজন যাত্রী রওনা হলাম রিসোর্টের দিকে।

ওনসেনের অভিজ্ঞতা

ইজু কোগেনের রিসোর্টটি দেখে আবারো আমরা মুগ্ধ। যে কোনো পাঁচ তারকা হোটেলের মতো সুসজ্জিত হলেও বাণিজ্যিক কোনো চেহারা নেই। কারণ এটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। টোকিও ইতাবাসি ক্যু (ওয়ার্ড)-এর অধীনে পরিচালিত এই রিসোর্ট ইতাবাসিতে বসবাসকারীরা শুধু থাকতে পারে।

এই রিসোর্টগুলো পুরোপুরি জাপানি ঐতিহ্য অনুসরণ করে। এই রিসোর্টের ভেতরেই রয়েছে ওনসেনের ব্যবস্থা। মূলত ওনসেনের জন্যই জাপানিরা এই রিসোর্টগুলোতে আসে। টোকিও থেকে শুনে এসেছি ওনসেন হলো ঝরনার পানিতে গোসল। কিন্তু ওনসেন রুমে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া, আগ্নেয়গিরি থেকে বের হওয়া প্রচন্ড গরম পানিকে কৃত্রিমভাবে তাপ কমিয়ে যাও প্রায় ৪০ ডিগ্রির বেশি গরম থাকে বিশাল সাইজের ওনসেন পুলে নিয়ে আসা হয়। একদিক থেকে পানি আসছে আরেকদিক দিয়ে পানি নেমে যাচ্ছে। সব সময় একই উচ্চতার পানি থাকছে ওনসেন পুলে। ছেলে আর মেয়েদের জন্য আলাদা ওনসেন রুম। বেশ কয়েকজন এক সঙ্গে এখানে গোসল করে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু বেঠিক ব্যবস্থা হলো ওনসেন রুমে কোনো প্রকার কাপড় পরে ঢোকা পুরোপুরি নিষেধ। এ যেন উষ্ণ দূষণমুক্ত পানিতে জন্ম দিনের প্রথম গোসল। সারাদিনের হাঁটার ক্লান্তির পর যখন দেখি রুমের টয়লেটের সবকিছু আধুনিক সাজে সজ্জিত থাকলেও গোসলের কোনো ব্যবস্থা নেই, একমাত্র ভরসা ওনসেন, তখন কেবলই মনে হলো একটু বেশি হয়ে গেলনা!

দুই দিন জাপানে প্রকৃতির নিসর্গে বেড়িয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম টোকিওর গতিশীল জীবনে, মানুষ এখানে কেবলই ছুটছে। যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে গিয়ে তারা কিন্তু মোটেই যন্ত্র হয়ে ওঠেনি। অবসরে তারা ঠিকই হাসে, আনন্দ করে, নিক্কো বা ইজুর মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অস্বাদ নেয়। যা তাদের প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দেয়। একারণে তারা তাদের প্রকৃতিকে এত ভালোবাসে, এত শ্রদ্ধা করে।